নারীর প্রতি পুরুষের আচরণের নেতিবাচক দিক

ড. রাজিয়া খানম

পুরুষতন্ত্র কর্তৃক সৃষ্ট জেন্ডার বৈষম্য উন্নত ও উন্নয়নশীল সকল সমাজেই বিদ্যমান। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও কর্মক্ষেত্রে সর্বত্রই নারীরা বৈষম্যের শিকার। বিশেষ করে বিদ্যমান পুরুষতান্ত্রিক সমাজে অর্থসম্পদ, নীতিনির্ধারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রশাসনের মতো গুরুত্বপূর্ণ সকল ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ পুরুষের হাতে থাকায় স্বাভাবিকভাবেই নারীকে অসহায়, ক্ষমতাহীন এবং পরিণতিতে বৈষম্যের শিকার হতে হয়। জৈবিকভাবে একটি শিশু স্ত্রীঅঙ্গ নিয়ে জন্মালেও সে জানে না সে নারী না পুরুষ। ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসনের বেড়াজালে তাকে মেয়েলি করে তোলা হয় এবং তার ওপর আরোপ করা হয় নানারকম বিধি-নিষেধ। সমাজব্যবস্থা কর্তৃক আরোপিত এই লিঙ্গ বিভাজন নারীর জন্যে বয়ে আনে নানা ধরনের বঞ্চনা, নির্যাতন ও নিপীড়ন। আর সে জন্যই নারীরা নির্যাতনের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়, যা আমরা বিভিন্ন সমাজ ও শাসনব্যবস্থায় দেখতে পাই। অর্থাৎ সমাজে মূলত পিতৃতান্ত্রিক আধিপত্য নারীর ওপর অন্যায়-অত্যাচার ও নানা ধরনের বৈষম্য সৃষ্টি করেছে। নারীর প্রতি পুরুষের বৈষম্যমূলক আচরণ নৈতিক দিক থেকে সমর্থনযোগ্য কি না এ প্রবন্ধে তা তুলে ধরা হয়েছে।

পুরুষতন্ত্র কর্তৃক তৈরি নারী-পুরুষের জেন্ডার বৈষম্যের বিষয়টি নারীবাদী দার্শনিকদের মাঝে আলোচিত হচ্ছে। নারীর অধিকার প্রশ্নে যে নারীবাদী দার্শনিক সুপরিচিত তিনি হলেন মেরী উলস্টোনক্রাফট। নারীবাদ মনে করে, নারী-পুরুষের মধ্যে জৈবিক পার্থক্য আছে কিন্তু এ পার্থক্যকে কেন্দ্র করে পুরুষতন্ত্র নারীকে অধস্তন করে রাখছে, শোষণ করছে, যা নীতিসম্মত নয়। মনোবিজ্ঞানী ও দার্শনিক ক্যারল গিলিগান ১৯৮০-র দশকে[১] নারী-পুরুষ বৈষম্য সম্বন্ধে গবেষণা করেন— যা নারীবাদীদের মধ্যে সচেতনতার সৃষ্টি করেছে। নারী ও পুরুষের মধ্যে জীবতাত্ত্বিক পার্থক্যকে তিনি অস্বীকার করেন না, কিন্তু এই পার্থক্যকে কেন্দ্র করে পুরুষতন্ত্র নারী-পুরুষের মাঝে যে অসমতা সৃষ্টি করে তা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সৃষ্ট বলে তিনি মনে করেন। নারীবাদ এই অসাম্য বা জেন্ডার বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। সমাজে নারী-পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে জেন্ডার এমন একটি কাঠামো গড়ে তোলে, যেখানে তাদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সুবিধা ও অসুবিধাজনক অবস্থান নির্ধারিত হয়। মূলত ক্ষমতা হাতে রাখার বা নিজেদের উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই পুরুষতন্ত্রের লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য তৈরি করার এই প্রয়াস, যা অনৈতিক ও অসমর্থনযোগ্য।

---

[১] Humm, Maggie, ed., 1992, *Feminisms: A Reader*, Harvester, Wheatsheaf, New York, P. 219.

পুরুষতন্ত্র কর্তৃক তৈরিকৃত জেন্ডার বৈষম্যের কারণে আমাদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি এমন যে, আমরা ধরেই নেই নারীর ভূমিকা হচ্ছে অধস্তনের, অপরদিকে পুরুষের ভূমিকা হচ্ছে শাসকের বা উর্ধ্বতনের। শিশুকাল থেকেই একটি ছেলে বা মেয়ে সমাজের এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে পরিচিত। নারী যুগ যুগ ধরে পুরুষতন্ত্রের চাপিয়ে দেয়া এই বিভাজন মেনে নিয়েছে। ফলে নারীর স্বাধীন সত্তার দিকটি উপেক্ষিত হয়েছে। আত্মসম্মান স্বাধীন সত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত বলে নারীর ক্ষেত্রে আত্মসম্মানের অভাব দেখা যায়। আত্মসম্মান মানুষকে মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার সচেতনতা প্রদান করে। আত্মসম্মান হলো নির্যাতনমুক্তভাবে বেঁচে থাকার হাতিয়ার। এই আত্মসম্মান ব্যক্তির মাঝে অনুপস্থিত থাকলে সমাজে নির্যাতন, নিপীড়ন দীর্ঘস্থায়ী হয়, যা অধিকাংশ সমাজব্যবস্থায় প্রচলিত।

সমাজে নারী-পুরুষ বৈষম্য এমনই প্রকট এবং মানুষের মাঝে এমনভাবে শিকড় গেড়ে আছে যে, তা দূর করা একটি কঠিন ব্যাপার। তাই নারীবাদীরা আন্দোলনের মাধ্যমে জেন্ডার বৈষম্য মোচনের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রতিবাদ প্রচারণায় যে বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন তা হলো নারীও 'মানুষ'— এ কথাটি সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা। কেননা নারীকে 'মানুষ' হিসেবে বিচার করা হয় কি না, তা নারীবাদীদের কাছে প্রশ্নসাপেক্ষ।[২] নারীবাদীদের মতে, নারী যখন সমাজে ব্যক্তি হিসেবে মর্যাদা পাবে তখন নারী-পুরুষ বৈষম্য বিলুপ্ত হবে এবং নারী নিপীড়ন অনেকাংশে হ্রাস পাবে। এক কথায় নারীর প্রতি পুরুষের নেতিবাচক আচরণের পরিবর্তন ঘটাতে হবে। ফলে নারীও যে মানুষ— এ ন্যায্য ধারণা প্রতিষ্ঠিত হবে।

নারীকে যদি মানুষ হিসেবে গণ্য করা হতো তাহলে নারী এভাবে সমাজে অধিকারবঞ্চিত হতো না। পরিবেশকে যেভাবে জড়, অসচেতন হিসেবে গণ্য করে অবমূল্যায়ন করা হয় নারীকেও তেমনি 'মানুষ' হিসেবে গণ্য না করে তাদের প্রতি অবহেলা করা হয়। অথচ আমরা বলে থাকি মানুষ হলো শ্রেষ্ঠজাতি, মনুষ্য জাতীয় জীব— যার স্বাধীন সত্তা রয়েছে, অধিকার কর্তব্যের বোধ রয়েছে। কিন্তু এ কথাগুলো নারীর ক্ষেত্রে কতটুকু প্রয়োগ করা হয় সেটিই বিচার্য বিষয়।

জীবতাত্ত্বিক দিক থেকে নারী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে, তবে ব্যক্তিসত্তার দিক থেকে উভয়ে অভিন্ন। তাই পুরুষকে যেমন 'ব্যক্তি', হিসেবে স্বীকার করা হয়, নারীকেও তেমনি ব্যক্তি হিসেবে স্বীকার করতে হবে— এটাই নারীবাদীদের মত। কেননা নারীও মানুষ, নারীর 'ব্যক্তি'সত্তাকে অস্বীকার করার পেছনে লিঙ্গবাদ, বৈষম্যবাদ ও ক্ষমতাবাদ যুগে যুগে ব্যবহৃত হয়েছে। নারীর প্রতি নেতিবাচক আচরণের পেছনে পুরুষতন্ত্র কর্তৃক আরোপিত বৈষম্যবাদই কাজ করেছে এবং করছে।

রেবেকা ওয়েস্ট (Rebecca West), ভেরা ব্রিটেইন এবং উইনিফ্রেডের মতে (Vera Brittain and Winifred Holtby) লিঙ্গগত শ্রম বিভাজন সমাজে নারী-পুরুষের অসমতার জন্য দায়ী। তাঁদের মতে, একটি সমাজের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন নির্ভর করে মানুষের চিন্তা-চেতনা ও সচেতনতার ওপর।[৩] তাই তাঁরা জেন্ডার ভূমিকা ও নারীর সম্ভাবনার দিকে মনোযোগ দিয়েছিলেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, সমাজে নারীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে নারীরা যেমন নিজেদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হবে তেমনি সমাজের কল্যাণ সাধন করতে পারবে। *German Ideology* গ্রন্থে মার্কস ও এঙ্গেলস বলেছিলেন, মানুষের মধ্যে প্রথম শ্রম বিভাজন হয় নারী ও পুরুষের

---

[২] খানম, রাশিদা আখতার, ২০০৫, *নারীবাদ ও দার্শনিক প্রেক্ষাপট*, সাহিত্যিকা, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৮৮।

[৩] Humm, Maggie ed., *Op. cit.* Page 15.

মধ্যে সন্তান উৎপাদনকে কেন্দ্র করে এবং ইতিহাসে প্রথম শ্রেণিদ্বন্দ্বও তৈরি হয় নারী ও পুরুষের মধ্যেই। প্রথম শ্রেণিশোষণ শুরু হয় নারীর ওপর পুরুষের শোষণের মাধ্যমে।[৪]

বহু সময় ধরে নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে। নারী-পুরুষের বৈষম্য থেকে সমাজে এমন মূল্যবোধ গড়ে উঠেছে, যা নারীকে অশ্রদ্ধার পাত্ররূপে গণ্য করেছে। এই বৈষম্যের মূলে রয়েছে মূলত পিতৃতন্ত্র। জৈবিক পার্থক্যের দোহাই দিয়ে পিতৃতন্ত্র নারী-পুরুষের মধ্যে দুই ধরনের মূল্যবোধ (যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) সৃষ্টি করেছে। আমাদের সামাজিক মূল্যবোধ এই দ্বৈত মনোভাব থেকে উৎপত্তি হয়েছে। এই দ্বৈত মূল্যবোধের কারণে পুরুষ নারীদের ওপর আধিপত্য বিস্তারে করেছে। একটি ছেলেশিশু এই মূল্যবোধ নিয়ে সমাজে বড়ো হয় যে, নারী পুরুষের অধীনে থাকবে এবং পুরুষ সমাজের অধিকর্তা। অপরদিকে একটি মেয়েশিশু এ মূল্যবোধ থেকে বড়ো হচ্ছে যে, নারী পরনির্ভরশীল অর্থাৎ পুরুষ তার ওপর কর্তৃত্ব করবে। এই মূল্যবোধকে নারী মেনে নিয়েছে এবং পুরুষ নারীর ওপর আধিপত্য বিস্তার করছে। আধিপত্য মানেই হলো তাতে শোষণ, নিপীড়ন, বঞ্চনা থাকবে। দ্বৈতবাদী চিন্তা থেকেই সমাজে শোষণ, নিপীড়ন শুরু হয় এবং এর মাধ্যমে নারীকে হেয় করে দেখা হয়।

তবে প্লেটো তাঁর বিখ্যাত *Republic* গ্রন্থে আদর্শ রাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থা ও সামাজিক কাঠামোর ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেন নি। তাঁর মতে, জীবতাত্ত্বিক দিক থেকে নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য আছে, কিন্তু রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে এ পার্থক্যের কোনো সম্পর্ক নেই। কাজেই পুরুষের ক্ষেত্রে যে শিক্ষা নারীর ক্ষেত্রে সে শিক্ষা। প্লেটো তাই বলেন, 'যে শিক্ষার কল্যাণে একজন পুরুষ যথার্থ অভিভাবক হতে পারেন, ঠিক একই শিক্ষার ফলে একজন মহিলাও উত্তম অভিভাবক হতে পারবেন'।[৫] প্লেটো একদিকে দ্বৈতসত্তায় বিশ্বাসী হয়ে পুরুষকে উচ্চ মর্যাদায় এবং নারীকে হীন মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন, অপরদিকে তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমঅধিকারের কথা বলেছেন। এদিক থেকে প্লেটোর মতাদর্শ আত্মবিরোধী দোষে দুষ্ট বললে অত্যুক্তি হবে না। তথাপি প্রকৃত বিচারে খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে[৬] প্লেটো নারী-পুরুষের সমঅধিকার ও নারীকে অভিভাবকত্বের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে যে ঔদার্য ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন, তা বিংশ শতাব্দীর নারীবাদীদের উৎসাহ যুগিয়েছে এবং এ কারণে নারীদের তিনি অধস্তন হিসেবে গণ্য করতেন এটা ন্যায়সঙ্গতভাবে বলা যায় না।

অ্যারিস্টটলও তাঁর মেটাফিজিকস (Metaphysics) গ্রন্থে স্তরায়নকে স্থান দিয়েছেন। প্রাণিজগতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাতে গিয়ে তিনি আত্মার শ্রম বিভাজন করেছেন। আত্মার শ্রম বিভাজন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ পর্যন্ত বিভিন্ন আত্মা ক্রমবদ্ধ অবস্থায় আছে। সবচেয়ে অনুন্নত আত্মাকে বলা হয় উদ্ভিদাত্মা। এ আত্মা শুধু উদ্ভিদেরই নয়, প্রাণীদেরও আছে। মানুষের আত্মা প্রাণীর চেয়ে উন্নততর। অ্যারিস্টটল এ আত্মার নাম দিয়েছেন প্রাজ্ঞিক আত্মা। সুখের প্রতি অনুন্নত আত্মার যে আসক্তি মানুষের আত্মায়ও তা বিদ্যমান। কিন্তু মানুষের আত্মায় একটি উন্নততর শক্তি বিদ্যমান, একে বলা হয় প্রজ্ঞা। এ বিশেষ গুণের কারণেই মানুষ জীবজগতে শ্রেষ্ঠ বলে আখ্যায়িত হয়।[৭] তাঁর এ বক্তব্য দ্বারা আমরা সমাজে উঁচু-নীচুর ধারণা পাই। এই উঁচু-নীচুর ধারণাটি আধিপত্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। আর আধিপত্যের ধারায়

---

[৪] মুহাম্মদ, আনু, ২০০৫, *নারী পুরুষ ও সমাজ*, সন্দেশ, ঢাকা, পৃষ্ঠা ২৮।

[৫] ইসলাম, আমিনুল, ২০০৪, *পাশ্চাত্য দর্শন : প্রাচীন ও মধ্যযুগ*, নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৯৩।

[৬] বেগম, হাসনা, ১৯৯০, *নৈতিকতা নারী ও সমাজ*, মাওলা ব্রাদার্স, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃষ্ঠা ২৭।

[৭] ইসলাম, আমিনুল, *পূর্বোক্ত*, পৃষ্ঠা ১২৪।

পুরুষ হলো উঁচু এবং নারী হলো নীচু।[৮] এই উঁচু-নীচুর ধারণা নারীর ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে পুরুষতন্ত্রকে উৎসাহ জোগায়।

আধুনিক যুগের দার্শনিক কান্ট ও ডেকার্ট যুক্তি ও আবেগের মাঝে পার্থক্য করেছেন, যেখানে দ্বৈততা প্রকাশ পেয়েছে। যুক্তিকে তাঁরা উচ্চমানের এবং আবেগকে নিম্নমানের বিষয় হিসেবে দেখেছেন। পুরুষতন্ত্র পুরুষকে যুক্তির অধিকারী বলে শ্রেষ্ঠ ও উচ্চতর এবং নারীকে আবেগের অধিকারীরূপে চিহ্নিত করে সমাজে নারীকে হীন ও নিম্নতর অবস্থানে অধিষ্ঠিত করেছে। আবেগকে এভাবে জেন্ডার বৈষম্যের সাথে তুলনীয় বলে মনে করা হয়। পুরুষ যুক্তির অধিকারী অপরদিকে নারী আবেগপ্রবণ— এ ধরনের দ্বৈততার সৃষ্টি করে পুরুষতন্ত্র নারীর ওপর আধিপত্য বিস্তার করে। নারী আবেগ দ্বারা প্রভাবিত হয় বলে উচ্চমার্গের চিন্তা করতে অপারগ হয়; যেখানে পুরুষ উচ্চমার্গের চিন্তা করতে সক্ষম হয়। পুরুষতন্ত্র মনে করে নারী আবেগকে বিসর্জন দিতে পারলেই পুরুষের সমকক্ষ হবে।[৯] আধুনিক বুদ্ধিবাদী দার্শনিকগণ বুদ্ধি এবং আবেগকে বিপরীত বিষয় বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা মনে করেন, কামনা-বাসনা, অপরের প্রতি সম্প্রীতিমূলক মনোভাব নিতান্ত ব্যক্তিগত বিষয়। আর যা কিছু ব্যক্তিগত তা পক্ষপাতমূলক, অপরদিকে যা কিছু নৈর্ব্যক্তিক, সার্বিক তা যৌক্তিক ও সমর্থনযোগ্য। নৈতিক কর্তব্যবোধকে দার্শনিকগণ নৈর্ব্যক্তিক বলে মত প্রকাশ করার কারণে যুক্তিবুদ্ধির বিপরীতে আবেগ-অনুভূতিকে হেয় করে দেখা হয় এবং এ আলোচনাকে নারীর বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হয়।

দীর্ঘকাল ধরে দার্শনিকগণ তাই নারীর আবেগ অনুভূতিকে অনির্ভরযোগ্য ও অমর্যাদাকার মনে করেছেন। ফলে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নারীর নৈতিক কর্তব্যমূলক মনোভাবকে মূল্যহীন বলে অস্বীকার করেছে। আধুনিকতা এভাবে যুক্তি ও আবেগের মাঝে এক অসম বিভাজনের সৃষ্টি করে এবং এই বিভাজন প্রকট হয়ে পুরুষকে উর্ধ্বতন ও নারীকে অধস্তন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। এই বৈষম্যই সমাজের দ্বৈত স্তরায়নকে যুক্তিসিদ্ধ করে। এ প্রসঙ্গে মিল বলেন, 'মানব ইতিহাস সম্পর্কে যার কিছু জ্ঞান আছে, সে দাবি করতে পারে না যে, সকল পুরুষ নারী অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ও চৌকস। গড়পরতা এমন কিছু কাজ পুরুষ পারে কিন্তু গড়পরতা নারী করতে পারে না— এ কারণ দেখিয়ে ঐ সকল কাজ নারীর জন্য নিষিদ্ধ করা সমর্থনযোগ্য নয়।'[১০] পুরুষের মতো নারী তার বুদ্ধিমত্তাকে বিকশিত করতে পারে না সুযোগের অভাবে। সুযোগ পেলে নারী তার মেধার বিকাশ ঘটাতে পারে তার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে; যেমন, ইন্দিরা গান্ধী, মাদার তেরেসা, রাণী এলিজাবেথ, বেগম রোকেয়া, মেরি উলস্টোনক্রাফট প্রমুখ। তা ছাড়া, নারীর মধ্যেই যে শুধু আবেগ আছে এ কথা জোর করে বলা যায় না। প্রতিটি মানুষের মধ্যে যেমন যুক্তিবুদ্ধি আছে, তেমনি আবেগ-অনুভূতিও আছে। কাজেই পুরুষতন্ত্র কর্তৃক সমাজে নারী-পুরুষের মধ্যে যে দ্বৈত মূল্যবোধ তা যুক্তিহীন। পুরুষতন্ত্রের মনগড়া ওই দ্বৈত মূল্যবোধ থেকে নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য তৈরি করা হয়েছে ক্ষমতা কুক্ষিগত করা ও প্রয়োগের জন্য। একটি সমাজে দ্বৈত মূল্যবোধ থেকে নারীর প্রতি যে নিপীড়নমূলক আচরণ করা হয় তা নৈতিক ও যৌক্তিক কোনোদিক থেকেই সমর্থনযোগ্য নয়। নারীর ব্যক্তিসত্তাকে খাটো করে তাকে অধিকারবঞ্চিত করা অনুচিত ও অযৌক্তিক। কাজেই এ দ্বৈততা শুধু অযৌক্তিক নয়, ভিত্তিহীনও বটে।

---

[৮] ভূঁইয়া, এ.এস.এম. আনোয়ারুল্লাহ, ২০০৭" "প্রতিবেশ নারীবাদ : দ্বৈতবাদ ও উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিত", *নারী ও প্রগতি*, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ-এর ষাণ্মাসিক জার্নাল, তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জানু-জুন, পৃষ্ঠা ৩০।

[৯] খানম, রাশিদা আখতার, *পূর্বোক্ত*, পৃষ্ঠা ৮৫-৮৬।

[১০] ইসলাম, মাহমুদা, ২০০৮, নারীবাদী চিন্তা ও নারী জীবন, জে. কে. প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স, পৃষ্ঠা ৯।

নারী ও পুরুষ উভয়েই মানুষ। উভয়ের মধ্যেই যুক্তি-বুদ্ধি, আবেগ-অনুভূতি, আত্মমর্যাদাবোধ, কর্তব্যবোধ রয়েছে। এগুলো মানুষের অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত। যদি তাই হয়, তাহলে একচেটিয়াভাবে আবেগ-অনুভূতি নারীর সাথে সম্পর্কিত এবং যুক্তি-বুদ্ধি পুরুষের সাথে সম্পর্কিত— এ ধরনের ধারণা অযৌক্তিক, সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক এবং সমাজনির্মিত। সমাজনির্মিত এ ধরনের যেকোনো দ্বৈতবাদী ধারণার অবসান ঘটাতে হবে। আর এ ধারণার অবসান ঘটলে সমাজে নারী ও পুরুষের মাঝে যে বৈষম্য বিরাজমান তা বিলুপ্ত হবে।

পুরুষশাসিত সমাজের ভিত্তি হচ্ছে দ্বৈত মূল্যবোধ। দ্বৈত মূল্যবোধ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাঁরা নারী ও পুরুষের কাজ ভাগ করে দিয়েছেন। এ শ্রম বিভাজন পুরুষের ইচ্ছা ও সহজাত প্রবৃত্তিকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। তবে এর চিত্র বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন রকম। তবে বিভিন্ন রকম হলেও এর মূল ভিত্তি উত্তম আর অধম এর পুরানো কাহিনি। শ্রম বিভাজন করতে গিয়ে পুরুষতন্ত্র নারীকে গৃহাভ্যন্তরে এবং নিজেদের বহির্জগতে অন্তর্ভুক্ত করে। নারীর কাজকে বলা হয় অনুৎপাদনমূলক (unproductive) এবং পুরুষের বহির্জগতের কাজকে বলা হয় উৎপাদনমূলক (productive)। নারী নিজের শ্রমের বিনিময়ে একটি সুখী সুন্দর পরিবার গঠনে সর্বদা নিজেকে নিয়োজিত রাখার চেষ্টা করে। অথচ নারীর শ্রমকে স্বীকার না করে তাকে নিম্নতর স্থানে অধিষ্ঠিত করে অসমতার সৃষ্টি করা হয়। এ বিভাজনের মধ্য দিয়ে নিশ্চিত করা হয় পুরুষের সাথে তার নিম্নতর অবস্থানের বিষয়টি। শতাব্দীকাল ধরে পুরুষতন্ত্রের চাপিয়ে দেয়া এই শ্রম বিভাজন নারী মেনে নিয়েছে। ফলে নারীকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে বা বিশ্বায়নের যুগে এসেও ন্যায্য অধিকারের জন্য আন্দোলন করতে হচ্ছে। আসলে সমাজে নারী-পুরুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন প্রয়োজন। দ্বৈত মূল্যবোধ নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি।

সমাজ নারীর প্রতি যে নেতিবাচক গুণাবলি (নারীর সামর্থ্য পুরুষের তুলনায় কম) আরোপ করে নারীকে হীন করে রেখেছে, তাকে জন স্টুয়ার্ট মিল কৃত্রিম বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, যে নীতি (দ্বৈতনীতি) দিয়ে নারী-পুরুষের মাঝে সামাজিক সম্পর্ক তৈরি করা হয়েছে তা ভ্রান্ত এবং মানুষের উন্নয়নের পথে একটি বাধাস্বরূপ।[১১] তিনি নারী-পুরুষের সমঅধিকার দাবি করেন বিবাহ আইনের সংস্কারের মাধ্যমে। তাঁর মতে, বিবাহসম্পর্কিত আইনের মাধ্যমে নারী সম্পত্তি, সন্তান ও নিজ সম্বন্ধে কর্তৃত্ব গ্রহণ করতে পারে।[১২] ফলে দ্বৈতনীতির পরিবর্তে সমতার নীতি প্রতিষ্ঠিত হবে। তবে বিবাহিত নারী গার্হস্থ্য কর্মকাণ্ডকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কর্তব্যমূলক মনে করবে এবং গার্হস্থ্যকর্মে বাধাস্বরূপ যেকোনো পেশা থেকে বিরত থাকবে। জুলিয়েট মিশেল মিলের সমতার নীতির সমালোচনা করেন এভাবে যে, বিবাহিত নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে তিনি (মিল) সমতার নীতিতে অটল ছিলেন না। সমতার নীতি সমর্থন করা সত্ত্বেও মিল (গার্হস্থ্য ক্ষেত্রে বিবাহিত নারীর কর্মের) যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা নারীর স্বাধীনতাকে খর্ব করে। তা ছাড়া, বিবাহিত নারীর ক্ষেত্রে তিনি পুরুষতান্ত্রিক শত বছরের চিন্তা-চেতনাকে সমর্থন করেছেন। নারী-পুরুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে মিল যে সমতার নীতির কথা বলেছেন, তা পিটার সিঙ্গারের মতের সদৃশ। তবে পিটার সিঙ্গার 'সমতার নীতি' কেবল মানুষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন নি, সকল প্রাণীর ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন।

---

[১১] খানম, রাশিদা আখতার, *পূর্বোক্ত*, পৃষ্ঠা ৮৮।
[১২] *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা ৩১।

পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধের কারণে এক সময় নারীকে স্বামীর সাথে চিতায় যেতে হতো, আরবে কন্যাশিশু জন্মানো মাত্র কবর দেয়া হতো। সময়ের বিবর্তনে এখন মানুষের চিন্তাধারার পরিবর্তন হয়েছে। সতীদাহ প্রথার বিলোপ সাধন করা হয়েছে, কন্যাসন্তানের কবর দেয়া বন্ধ হয়েছে, নারী শিক্ষিত হচ্ছে। কিন্তু নারী নিপীড়ন এখনো বন্ধ হয় নি। কেননা পুরুষতন্ত্র নারীকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে (মানুষ হিসেবে) কখনো মূল্যায়ন করে নি বরং নারীর প্রতি তাদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিই কাজ করেছে এবং করছে। ফলে সর্বত্রই (সামাজিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক ও শ্রমের ক্ষেত্রে, এমনকি সম্বোধনের ক্ষেত্রেও) নারীর প্রতি নিপীড়ন, শোষণ, বৈষম্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাই নারীজাতি পুরুষতন্ত্রের এই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বা নিপীড়ন থেকে মুক্তি পাবার লক্ষ্যে যুগে যুগে পথ খুঁজছে কিন্তু বারবার তাদের আশাহত হতে হয়েছে। ফরাসি বিপ্লবের সময় নারীদের প্রধান দাবি ছিল ভোটাধিকার ও নারী-পুরুষের সমান মজুরি— কিন্তু তাদের প্রাপ্য তারা পায় নি। নারীমুক্তির কথা বিবেচনা করে জাতিসংঘ মেক্সিকোতে বিশ্ব সম্মেলন করে। প্রথম বিশ্ব সম্মেলনে নারীর সমস্যাগুলো গুরুত্ব পায় এবং ১৯৭৫ সালের ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়।[১৩] একই উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ নাইরোবিতে অনুষ্ঠিত তৃতীয় সম্মেলনে ১৯৭৫ থেকে ১৯৮৫ সালকে ‘নারী দশক’ হিসেবে ঘোষণা দেয়।[১৪] এরপর থেকে ৮ মার্চকে সমগ্র বিশ্বে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালন করা হয়ে আসছে। অথচ নারী নিপীড়নের মাত্রা কোনো অংশেই কমে নি বরং তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নারী নিপীড়ন চোখে পড়ার মতো।

আমরা আমাদের আলোচনায় লক্ষ করছি যে, নারী সমাজে যতটুকু অধিকার অর্জনে সক্ষম হয়েছে তার অধিকাংশ আন্দোলনের মাধ্যমেই পেয়েছে এবং নারী নিপীড়নের চিত্র আন্দোলনের কারণেই জনসম্মুখে উঠে এসেছে। নারী আন্দোলন বিশ্বব্যাপী পরিলক্ষিত হচ্ছে। ফলে নারী নিপীড়নের কেবল মাত্রাগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। অর্থাৎ অতীতে নারীকে শারীরিকভাবে নিপীড়ন করা হতো কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে মানসিক নিপীড়নের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে শারীরিক নিপীড়ন তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশের নিম্নবিত্ত নারীদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। এই নিম্নবিত্ত নারীরাও তাদের ওপর নিপীড়ন বন্ধের জন্য আন্দোলন করছে। শিক্ষিত নারীদের মধ্যেও যে শারীরিক নিপীড়ন একেবারেই নেই তা বলা যাবে না। নারী নিপীড়ন দূর করতে হলে পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিবর্তন করতে হবে এবং নারীকে ‘ব্যক্তি’ হিসেবে মর্যাদা দিতে হবে— প্রতিটি মানুষ একজন ব্যক্তি, তা সে নারী হোক বা পুরুষ হোক। সাধারণত মানুষ প্রত্যয়টির সঙ্গে ন্যায়বোধ ও মানবতাবোধ জড়িত বলে মনে করা হয় এবং সে জন্য মানুষের প্রতি মানুষের ন্যায়সঙ্গত আচরণ পালনের প্রশ্ন ওঠে। নীতিবোধ বিবর্জিত মানুষকে মানুষ বলা যায় না। নীতিবোধের কারণেই মানুষ অন্যান্য প্রাণী থেকে পৃথক। তাই মানুষকে নিজ বৈশিষ্ট্যের মর্যাদা দিতে হলে ন্যায়পরায়ণ আচরণ করা উচিত। কিন্তু মানুষ ন্যায়-নীতিবর্জিত কাজ করছে, ফলে সমাজে অসাম্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে। পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিবর্তন এবং নৈতিক আচরণের অনুশীলন নারী নিপীড়ন দূর করতে পারে। সাধারণভাবে নীতিবোধ মর্যাদাকে লালন করে। কেবল আন্দোলন বা আইন করে মানুষের মধ্যে মর্যাদাবোধ সৃষ্টি করা যায় না, মূল্যবোধের পরিবর্তনও প্রয়োজন। আর মূল্যবোধের পরিবর্তনের জন্য নীতিবোধের অনুশীলন করা অত্যন্ত জরুরি। নারীবাদীরা আন্দোলনের মাধ্যমে যে নারী নিপীড়ন দূর করার কথা বলেছেন, তার সাথে আরো কিছু বিষয় যোগ করা প্রয়োজন।

---

[১৩] Mahtab Nazmunnessa, 2007, *Women in Bangladesh from Inequality to empowerment,* A.H. Development publishing House, New market, Dhaka, Page 179.
[১৪] *Ibid*, Page 179.

প্রথমত, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন প্রয়োজন। এজন্য নৈতিক বোধ আবশ্যক— যা বাস্তবে মানুষকে নীতিসম্মত আচরণ করতে সহায়তা করবে। দ্বিতীয়ত, অধিকাংশ মানুষ বিবেক দ্বারা পরিচালিত হয় না বিধায় আন্দোলন করতে হয় আইন প্রণয়নের জন্য। কারণ ব্যক্তি যদি নীতিসম্মত আচরণ না করে তবে আইনের আশ্রয় গ্রহণ করা সম্ভব হবে। তৃতীয়ত, আইন শুধু কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ না রেখে অনুসরণে বাধ্য করলেই প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধিত হবে। ফলে নারীরা নিপীড়ন ও শোষণের হাত হতে রেহাই পাবে এবং মর্যাদাকর অবস্থানে অধিষ্ঠিত হবে, যা নৈতিকভাব সমর্থনযোগ্য।

ড. রাজিয়া খানম প্রভাষক, দর্শন বিভাগ, তেজগাঁও কলেজ, ঢাকা। raziakhanom2014@gmail.com